একটা উন্নয়নের গল্প

মওদুদুর রহমান

ভারতের এক 'উন্নয়ন প্রকল্প', তার থেকে প্রাপ্তি আর তার কারণে মানুষের জীবন জীবিকার ধস, আর সেই সঙ্গে এর সঙ্গে যুক্ত এক শিক্ষকের উপলব্ধি নিয়ে এই কাহিনী। এটি বর্তমানকালের অনেক কাহিনীর একটি..

Development is putting more choices to the people. প্রফেসর আনন্দ রাওয়ের এই কথাটা শুনে একটু নড়েচড়ে বসলাম। উন্নয়ন চিন্তার আধুনিকতম সংজ্ঞায় পণ্য বা সেবা কেনার সক্ষমতার মাপকাঠিকে বাদ দিয়ে কেন সেটার বৈচিত্র্য হাজির করার প্রতিযোগিতা উস্কে দেওয়া হয়েছে, সে প্রশ্ন করতে তৈরি হলাম। আসলে সেটা ছিল তাঁর লেকচারে আমার প্রথম দিন। আমি তখনো জানতাম না যে প্রফেসর আনন্দ তাঁর ক্লাসে বিষয়ভিত্তিক বিতর্ক তৈরির জন্য লেকচারের ফাঁকফোকরে এ ধরনের বিষয়গুলো ঢুকিয়ে দেন আর ক্লাসের শেষ ১০-১৫ মিনিট এ বিষয়ে সবাই সবার মতামত দেয়। এ আলোচনায় সবাই এতটাই আগ্রহ নিয়ে উন্নয়ন ধারণার ত্রুটিবিচ্যুতি তুলে ধরতে থাকে যে প্রায়ই স্যারকে তাঁর পরের লেকচারের জন্য রীতিমতো দৌড় লাগাতে হয়।

Ecology and Environment এর এই কোর্সে ক্লাসের প্রতিদিনকার বিতর্কে আরো প্রাণ দিতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় দুই দিনের একটা ফিল্ড ভিজিটে। আমরা যাই মুম্বাই থেকে প্রায় ২৪০ কিলোমিটার দূরে ডিম্ভে এলাকায়। সেখানে গোধ নদীর ওপর তৈরি করা ড্যামটির কাজ শুরু হয় আশির দশকের শুরুর দিকে, সরকার জমি অধিগ্রহণ করে তারও আগে আর সেটি নির্মাণ শেষ হয় ২০০০ সালে। এটি মূলত সেচ প্রকল্পের জন্য হলেও ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎও আসছে এখান থেকে। এর মাধ্যমে প্রায় ১৪ হাজার হেক্টর জমিতে খালের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। একফসলি জমি দোফসলি হয়েছে; ধান, পেঁয়াজ আর টমেটোর পাশাপাশি আখ আর ভুট্টার আবাদ শুরু হয়েছে। উন্নয়নের পোস্টারিংয়ে সকলকে ভুলিয়ে রাখতে এর চেয়ে চটকদার আর কী লাগে! কিন্তু এই বিজ্ঞাপন পর্দার আড়ালে উন্নয়নের ফলে আমাদের পাওয়া 'একটু টক আর একটু ঝাল' স্বাদের ঠিক বিপরীতেই যে মানুষ-প্রাণ-প্রকৃতি-জল-জঙ্গল-জীবিকার শ্মশান তৈরি হতে থাকে—এ খবর নেওয়াটা সব সময় বাকিই থেকে যায়।

ভীমাশংকর এলাকায় শতকরা ৯৯ জনই আদিবাসী। এরা কোলি মহাদেও, থাকার আর কাথাকারিস—এই তিন গোত্রে বিভক্ত। ডিম্ভে বাঁধের ফলে পানিতে তলিয়ে যায় তাদের ১১টি গ্রামের প্রায় ২২০০ একর জমি। সরকারের জবরদখলের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার মতো সাহস তাদের ছিল না।

ভীমাশংকর এলাকায় শতকরা ৯৯ জনই আদিবাসী। এরা কোলি মহাদেও, থাকার আর কাথাকারিস—এই তিন গোত্রে বিভক্ত। ডিম্ভে বাঁধের ফলে পানিতে তলিয়ে যায় তাদের ১১টি গ্রামের প্রায় ২২০০ একর জমি। সরকারের জবরদখলের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার মতো সাহস তাদের ছিল না। তাদেরকে তখন ক্ষতিপূরণ আর পুনর্বাসনের আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু জমির হিসাব তাদের কাছে ছিল এক রকম, অর্থাৎ তারা জমির হিসাব রাখত তাদের সনাতনি পদ্ধতিতে আর সরকার করল আরেক পদ্ধতিতে। এর ফলে জমির পরিমাণ গেল কমে। আর তাদেরকে ঠকানোর সেটাই ছিল শুরু। জমির ক্ষতিপূরণ হিসেবে একরপ্রতি তাদের দেওয়া হলো ৫০০ রুপি। আবার সেখান থেকে পুনর্বাসনের জায়গার দাম ধরে কিছু অংশ কেটেও রাখা হলো। মূল জমি থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে যেখানে তাদের পুনর্বাসন করা হলো, সেখানে সকলের জন্য বরাদ্দ হলো ২০০০ স্কয়ার ফিট জায়গা। কিন্তু কোনো কৃষিজমি দেওয়া হলো না। সেখানে চাষবাসের জন্য জমি কিনতে গিয়ে দেখা গেল, দাম অনেক বেশি আর জমিও পাথুরে। তার পরও তারা যতটুকু জমি কিনতে পেরেছে, তা-ও এখন আদিবাসীসুলভ সারল্যের সুযোগ নিয়ে আশপাশের স্থানীয় মানুষ দখল করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। আগে তারা নদীর পানি থেকেই সেচ দিত, আর এখন খাল থেকে পানি তুলে আনতে ডিজেল পোড়াতে হয়; আগে ডালপাতা কুড়িয়েই রান্নার কাঠ জোগাড় হয়ে যেত, আর এখন এলপিজি সিলিন্ডার কিনতে হয়। আগে গবাদি পশুর খাবার নিয়ে চিন্তা ছিল না, আর এখন ওগুলোকে খাওয়ানোরও চিন্তা করতে হয়।

আমরা তাদের সাথে কথা বলতে খাদকিতে গিয়েছিলাম। সেখানে কলোনির মতো করে বানানো সারি সারি একতলা বাড়ি। সেখানে গিয়ে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম। তাদের জন্য সরকারি চাকরিতে ৫ শতাংশ কোটা রাখা আছে। কিন্তু এটাও মস্ত বড় এক ধাপ্পাবাজি। এই সুযোগ তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য নয়, বরং মালিক হিসেবে যারা জমি হারিয়েছে কেবল তাদের জন্য। আর এজন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল কলেজ পাসের সার্টিফিকেট। অথচ তারা যে এলাকায় থাকত, সেটার আশপাশের কোথাও প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত ছিল না।

জমি অধিগ্রহণের সময় তাদের যে নগদ টাকা দেওয়া হয়েছিল, সেটা অল্প সময়েই নানাভাবে খরচ হয়ে গেছে। অনেকে পুনর্বাসনের জমির জন্য প্রথম কিস্তির টাকা সময়মতো দিতে পারেনি। ফলে ২৭৫টি পরিবার এখন পর্যন্ত তাদের জমিও বুঝে পায়নি। জমি পেতে তাদের ১৯৯৩ সালের করা মামলা এখনো চলছে। পরিবারের সদস্যসংখ্যা হিসাবে তাদের কৃষিজমি কিনে নিতে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যে হিসাবে তারা এই টাকা পেল, সেটা নিয়ে শহরে এসে জমি কেনার সময় দেখা গেল যে দাম কয়েক গুণ বেশি।

খাদকিতে দুপুরের খাবারের পর উঠানে মাদুর বিছিয়ে আমরা সবাই একসাথে বসলাম। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যোগ দিল এই আলাপে। তাদের কথায় অন্তরের হাহাকার টের পেতে কারো কোনো কষ্ট হয়নি। খাদকিতে তাদের এক প্রকার জোর করেই নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু এই আদিবাসী পরিবারগুলোকে সমতলের মানুষ ভালোভাবে নিতে পারেনি। এখন পর্যন্ত কিছু কিছু কুয়া থেকে পানি

পর্যন্ত আনতে দেওয়া হয় না। কিন্তু তাদের জমি দখল করতে সমতলবাসীর কোনো সমস্যা নেই!

'...কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে বাঁধের ফলে কিছুটা হলেও কোনো না কোনোভাবে ক্ষতির তুলনায় লাভ বেশি হয়েছে?' দিগ্বিজয়ের এই প্রশ্নের উত্তর মনে হলো খারাতের তৈরিই ছিল। সে বলল, 'বাঁধ তৈরির আগে আমরা শুধু ধান, সবজি আর পেঁয়াজ করতাম। আর কিছু না হইলেও খাওয়ার চিন্তাটা ছিল না। কিন্তু বাঁধের পানি আসার পর সবাই এখন আখ করতে চায়। আর আখের ক্ষেত রাক্ষসের মতো পানি খায়। আখ খাইয়া তো পেট ভরে না, কিন্তু টাকা মেলা। এখন সবাই মিইল্যা যদি আখই করে, তবে খাওন আইবো কই থিইকা? আর এত পানিই বা আইবো কই থিকা? তাইলে এই বাঁধে লাভটা কই হইলো! এইটা তো আপনার অভাব কমাইলো না; বরং আরেক অভাবের জায়গা বানাইলো।'

'তাহলে কি বলতে চান যে, কোনো বাঁধ বানানোর দরকার নাই?'

'আছে। কিন্তু একবারে এত বড় না বানাইয়া সবার সাথে পরামর্শ কইরা ছোট ছোট কইরা বানাইলে ভালো'– এবার জবাব এলো সীতারামের কাছ থেকে।

পরের দিন সকাল ৬টায় ঘুম থেকে উঠেই আমরা রওনা দিলাম আহুপের উদ্দেশে। দখলবাজির এই সময়ে এসেও ভীমাশংকর জঙ্গলের এখন পর্যন্ত টিকে থাকা দম বন্ধ করা সৌন্দর্য অবাক হয়ে দেখছিলাম। এখানকার সবকিছুই যেন প্রকৃতি তার সব ঐশ্বর্য ঢেলে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। প্রথমে আমরা গেলাম দেবরাইয়ে। দেবরাই হচ্ছে দেবতার আবাস। সাত-আট একর জায়গা নিয়ে একেকটি দেবরাই। এখান থেকে কেউ মাটিতে পড়ে থাকা পাতাটি পর্যন্ত নিয়ে যায় না। শুধুমাত্র মাসে একবার দেবতাকে ঘিরে উৎসবের সময় এখানকার কুড়ানো ডালপালা, পাতা দিয়ে সকলের জন্য রান্না করা হয়। দেবরাইয়ের জায়গা কোনো একটি পরিবারের অধীনে থাকে, কিন্তু গ্রামের সবাই মিলেই এর যত্ন নেয়, পাহারা দেয়। আশপাশে এরকম অনেকগুলো দেবরাই আছে। আমরা এখন 'অভয়ারণ্য' ঘোষণা করে প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষা করার চেষ্টা করি আর তারা পুরো জঙ্গলকেই দেবতা বানিয়ে অজানা কাল থেকে এটির সুরক্ষা প্রদান করাকে ধর্মকর্মে পরিণত করেছে।

> পরিবারের সদস্যসংখ্যা হিসাবে তাদের কৃষিজমি কিনে নিতে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যে হিসাবে তারা এই টাকা পেল, সেটা নিয়ে শহরে এসে জমি কেনার সময় দেখা গেল যে দাম কয়েক গুণ বেশি।

আদিবাসী নেতা বুদ্ধা রামজি মনের ক্ষোভ ঝেড়ে বলছিলেন, 'শত শত বছর ধইরা এই বন দেইখা রাখলাম আমরা। দেবতা জ্ঞান কইরা এর নাম দিলাম ভীমাশংকর। আর এখন সরকারি খাতায় আমরাই হইয়া গেছি বনে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। ২০০৬ সালের আইনে কইলো বনের মধ্যে আমরা নাকি থাকতে পারুম না। অথচ আমরা বনের কোনো অনিষ্ট করি না, গাছ কাটি না; খালি মরা ডালপাতা কুড়াই। আগে নানা জাতের জীব-জানোয়ার, পাখ-পাখালি আছিল। আর এখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের নতুন জরিপে দেখবেন এখানে চিতাবাঘের সংখ্যা মাত্র ৫টা। এহন কন যে, বন কেডা নষ্ট করলো? আমরা নাকি সভ্য মানুষরা?'

কিন্তু এত কিছুর পরও আশার কথা হচ্ছে, এখানকার মানুষরাও সংগঠিত হচ্ছে। আর তাদেরকে ন্যায্য অধিকার আদায়ে সংগঠিত করতে ৩০ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছেন আনন্দ কাপুর আর কুসুম কার্নিক। এখানকার মানুষদের কাছে এই দুজন মানুষ আত্মার আত্মীয়। এখানে তাঁরা সকলের কুসুম তাই আর কাপুর মামা। তাঁরা প্রথমে বিভিন্ন এনজিওর সাহায্য নিয়ে সংগঠনের কাজ করতেন। পরে শাসওয়াত নামে নিজস্ব এনজিও চালু করেন। শাসওয়াতের ব্যবস্থাপনায় আর আইআইটি বোম্বের কারিগরি সহায়তায় বাঁধের পানিতে মাছ চাষ প্রকল্পশুরু করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে যারা এখনো এই এলাকায় নিজ জায়গাজমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে এখানে-সেখানে আছে, তারা নিজেদের মধ্যে সমিতি করে এই মাছ চাষের কাজ করছে। প্রতি মাসে মাছ ধরার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে একেকটি পরিবার তিন হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করছে। আঘানে গ্রামে শাসওয়াত একটি আবাসিক স্কুল পরিচালনা করছে। এখানে বর্তমানে সব ক্লাস মিলিয়ে ২২১ জন ছেলেমেয়ে পড়ছে, যাদের সবাই আদিবাসী। আমরা এই স্কুলেই রাত কাটিয়েছি। আমাদের ফিল্ড ভিজিটকে ঘিরে স্কুলের ছেলেমেয়েদের প্রস্তুতি আর নানা আয়োজনের ব্যাপকতায় আমরা রীতিমতো বিস্মিত হয়েছি।

ফেরার পথে আবারও পাড়ি দিতে হলো ছয় ঘণ্টার পথ। দুই দিনের পাহাড়ি পথ চলার ভীষণ ক্লান্তিতে প্রায় সময়টাই ঘুমিয়ে আসছিলাম, আর বাকি সময়টায় কানে বাজছিল খারাতের বলা সেই কথা, 'যে উন্নয়ন সমাজের বড় অংশের ভালোর দোহাই দিয়ে ছোট অংশের জমি দখল করে, জীবিকার অধিকার কেড়ে নেয়, নদীকে বানায় খাল আর গাছ হয়ে যায় ফার্নিচার, সেটা কেমনতর উন্নয়ন! সেটা কিসের আধুনিকতা!'

পরিশিষ্ট

আমাদের আগেই জানানো হয়েছিল যে কুসুম কার্নিকের সাথে আমাদের কথা বলার সুযোগ হবে। দুই বছর আগে তাঁর হার্ট অ্যাটাকের পর থেকে তিনি শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রফেসর রাও আমাদের বেশি প্রশ্ন না করতে অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিলেন। চিপকো আন্দোলনে তিনি যুক্ত ছিলেন জানতে পেরে আমি তাঁর সাথে দেখা করার জন্য খুবই উৎসাহী ছিলাম। মনে মনে ওই আন্দোলনের খুঁটিনাটি জানতে কিছু প্রশ্নও তৈরি করে রেখেছিলাম। কিন্তু তাঁর শারীরিক দুর্বলতা স্বচক্ষে দেখার পর এক ঘণ্টার আলাপ আর বেশি টেনে নিতে মন সায় দিল না। তাঁর সাথে আমাদের কথাবার্তা ছিল এরকম :

প্রশ্ন: একটু শুরু থেকে যদি আমাদের বলেন, মানে কী করে আপনি এত দূরের মানুষদের সাথে, বিশেষ করে আদিবাসীদের জীবনের সাথে জড়িয়ে গেলেন?

কুসুম তাই: আমার বেড়ে ওঠা মুম্বাইতে। আর দশটা পরিবারের মতোই ছিল আমাদের জীবনযাপন। এমন নয় যে আমার পরিবারে এমন কেউ ছিল, যাকে দেখে আমি অনুপ্রেরণা পেয়েছি। এমনও নয় যে আমার কাজে আমার পরিবারের সমর্থন ছিল। মুম্বাইয়ে পড়াশোনার পাট শেষ করে আমি শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেই। আর সেই সাথে আমার ভেতর মানুষের জীবন-সমাজ-পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে দানা বাঁধতে থাকা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে থাকি। হঠাৎ করেই চলে যাই ভীমাশংকরের জঙ্গলে আদিবাসীদের গ্রামে। সত্তরের মাঝামাঝি সময় থেকেই ওদের জমি নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু আমি সেখানে গিয়েই ওদের বোঝানোর চেষ্টা

করিনি যে এই জবরদস্তিগিরির বিরুদ্ধে সবাইকে এক হতে হবে; বরং ওদের জীবনটাকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। ওই জীবনটা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। আর সেই থেকে আমার পুরো জীবনটাই পাল্টে যায়।

প্রশ্ন: সেটা কী রকম?

কুসুম তাই: সেটা তো এমন নয় যে আমি একটা-দুইটা করে বলতে পারব। বলতে পারি, আগের জীবনের 'আমি' আর ওদের সাথে মেশার পরের 'আমি' জীবনচর্চার ধরনের দিক দিয়ে একেবারেই আলাদা। আমি ছিলাম নিরামিষাশী। ওখানে গিয়ে ওদের সাথে মাংস খেতে শিখলাম। মাঝেমধ্যে শিকারে বেরিয়ে ওরা যদি কিছু পেত তাহলে সকলেই ভাগ-বাটোয়ারা করে খেত। আমি যদি না খেতে চাইতাম তাহলে ওরা মনে কষ্ট পেত। তাই আমিও খাওয়া শুরু করলাম। সেখানে ওদের অভাব ছিল, কিন্তু কোনো অভিযোগ ছিল না। সেখানে কোনো দিনই খারাপ কাটত না, তবে বেশি ভালো দিনের সংজ্ঞা ছিল, যেদিন ভাতের সাথে লবণের জোগানটাও থাকত। একবার একজন বলছিল যে ওর কাছে ভালো সময় বলতে বোঝায় ওর পরিবার পর পর তিন দিন না খেতে পেয়ে থাকে–এমন অবস্থা তৈরি না হওয়া।

প্রশ্ন: তো, আপনিও ওদের সাথে না খেয়ে থাকতেন?

কুসুম তাই: হ্যাঁ, আমিও কখনো আধপেটা খেয়ে, কখনো না খেয়ে থাকায় অভ্যস্ত হতে শুরু করলাম। খেতে না পাওয়াটা ওদের কাছে তেমন একটা কষ্টের ছিল না। নাগরিক জীবনের সবকিছু না পাবার হাহাকারের বদলে ওদের জীবনে ছিল সবকিছু ভাগ করে নেওয়ার শান্তি।

প্রশ্ন: আপনার পরিবার থেকে কোনো বাধা আসেনি?

কুসুম তাই: বাধা যে আসেনি তা বলা যাবে না, আবার বাধা দিয়েছে সেটাও বলতে পারি না। আমি তো অন্যায় কিছু করছিলাম না। শহরে থাকতে শুধু শিখেছি কী করে নিজের ভাগটা বড় করা যায়, আর ওদের কাছে শিখেছি কী করে নিজের ভাগ আরেকজনকে দিয়ে খুশি করা যায়। আমি নতুন সেলাইয়ের কোনো কাপড় পরি না। বহু বছর হলো আমি অন্যের পুরনো বাতিল হয়ে যাওয়া ছেড়াফাটা জামা, শাড়ি সেলাই করে পরি। আমার বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীদের বলে রাখি যে তোমাদের বাতিল কাপড় থাকলে আমাকে দিয়ো। এই শিক্ষাটা তো এই তথাকথিত আধুনিক সমাজে পাইনি। এটা পেয়েছি ওদের কাছ থেকে; যদিও আমাকে কেউ এখন পুরনো কাপড় দিতে চায় না। দু-এক দিন পর বলে যে এটা বেশ পুরনো কাপড়। তুমি নাও। কিন্তু আমি বুঝতে পারি...(হাসি)

প্রশ্ন: তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি আছে?

কুসুম তাই: দেখো, প্রথম কথা হচ্ছে, এ ব্যাপারে মন্তব্য করার আমি কেউ না। তবে যদি নির্দিষ্ট করে জানতে চাও, তবে এতটুকু বলতে পারি যে ভালো মানুষ হবার শিক্ষাটা বর্তমান ব্যবস্থায় নেই। আমরা শুধু শিখি কিভাবে প্রতিযোগিতায় যুক্ত হতে হয়, কিন্তু কোথায় থামতে হবে সেটা জানি না।

প্রশ্ন: কিন্তু উন্নয়ন, মানে এই বাঁধ কিংবা কোনো বড় প্রজেক্ট, এগুলোরও তো দরকার আছে...

কুসুম তাই: অবশ্যই আছে। কিন্তু তা হতে হবে যাচাই-বাছাই এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং সকলের মতামত নিয়ে। সেই সাথে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে তাদের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিতে হবে। এটা তাদের প্রতি কোনো দয়া নয়; বরং তাদের ন্যায্য পাওনা।

প্রশ্ন: ভীমাশংকরের আদিবাসী মানুষদের কথা যদি ধরি, তাহলে আপনি কী মনে করেন? মানে তাদের জীবনে কি উন্নতি আসেনি?

কুসুম তাই: উন্নতি এসেছে কি না জানি না। তবে তারা এখন একে অপরকে ঠকাতে শিখেছে। তাদের মধ্যেও নিজ নিজ হিসাবের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, যা শহুরে সংস্পর্শে আসার আগে ছিল না। তবে এই কালে এসে কেউ তো আর অবিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। তাই শহরের অস্থিরতা, ঈর্ষাকাতরতা আর প্রতিযোগিতা ভীমাশংকরের জীবনে এসে গেছে।

প্রশ্ন: ঈশ্বর চিন্তা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন...

কুসুম তাই: কার? ওদের, না আমার? (হাসি)

প্রশ্ন: দুইজনেরটাই।

কুসুম তাই: ঈশ্বর কোথায় আছে আমার জানা নেই, আবার তার অস্তিত্ব নেই এ ব্যাপারেও আমার যুক্তি নেই। আমি এ বিষয়ে ভাবি না। আর ওদের জীবনের দিকে তাকালে দেখবে যে ঈশ্বরের উপস্থিতি সেখানে বিদ্যমান, কিন্তু তা সব সময় না। ওরা ঈশ্বরের কাছে খাবার চায় না, বরং শিকার ধরতে পেলে সেটার গলায় ছুরি চালানোর আগে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চায়। আমাদের মতো ওদের কাছে ঈশ্বর বিদ্যার দেবী সরস্বতী কিংবা ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মী না; ওদের কাছে ঈশ্বর হচ্ছে সকল জীবন একের সাথে অপরের মিলবার উপলক্ষ।

ওরা ঈশ্বরের কাছে খাবার চায় না, বরং শিকার ধরতে পেলে সেটার গলায় ছুরি চালানোর আগে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চায়।

প্রশ্ন: আপনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার কথা কখনো চিন্তা করেননি?

কুসুম তাই: আমি কখনো রাজনীতিতে অংশ নেইনি। এমন নয় যে আমি নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভয় পাই বা এরকম কিছু। কিন্তু রাজনীতির প্রতিযোগিতা তো সুস্থ নয়, তাই আমি এখান থেকে দূরে থেকেছি। কিন্তু মেধা (মেধা পাটেকর) এসব ব্যাপারে চিন্তাভাবনায় অনেক এগিয়ে (উল্লেখ্য, মেধা পাটেকর নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী এবং কুসুম কার্নিকের ঘনিষ্ঠজন)।

প্রশ্ন: এই অসুস্থতার মধ্যেও আপনি আমাদের সময় দিলেন, এজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার এই জীবনাচরণ ও চিন্তাভাবনায় অনুপ্রাণিত বোধ করছি।

কুসুম তাই: আমার জীবনাচরণকে অনুসরণ করার কিছু নেই। তোমরা তোমাদের মতো ভাবো। নিজের পথ নিজেই বের করো। আমার চিন্তাই যে সঠিক, এমন তো নয়। তোমরা যে কোনো সময় আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো। কিংবা এখানে সরাসরি চলেও আসতে পারো। কষ্ট করে আমার এখানে আসার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ।
(মারাঠি ও হিন্দি ভাষায় কথোপকথন অনুবাদে সাহায্য করেছেন প্রফেসর আনন্দ রাও এবং আমার সহপাঠীরা)

মওদুদুর রহমান: প্রকৌশলী
ইমেইল: mowdudur@gmail.com